বাংলা বানানের হাল-হকিকত

❑ ড° প্রশান্ত চক্রবর্তী

এক

বাংলা ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে এ-মুহূর্তে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় নিঃসন্দেহে বাংলা বানান। বস্তুত, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যায়তনিক ও অ-বিদ্যায়তনিক উভয় ক্ষেত্রেই আলোড়ন চলছে ; চলবেও দীর্ঘদিন। চলবে ; কেননা বহু বানানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। 'এটাও চলবে—ওটাও চলবে' নীতি বহাল থাকছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতের অমিল সমাধানের রাস্তাকে ঘোরালো করে তুলেছে। এরমধ্যে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতন খবরের কাগজগুলো আপনমনে যে যার মতো বানান নিয়ে খেলছে। বাংলা তিনটি দৈনিক কাগজ পরপর হাতে নিলেই অরাজকতার ভয়ংকর রূপটি চোখে পড়বে। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা বানানের বিতিকিচ্ছি অবস্থার জন্য একমসয় সংস্কৃত-পন্থী মাষ্টারমশাইরাই দায়ী ছিলেন। আর, এখন, সেই কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতি বজায় রাখার দায়িত্ব নিজেরাই ঘাড় পেতে নিয়েছে কাগজওয়ালারা।

বাংলা বানান আজকে যে-জায়গায় এসে পৌছেছে, সেখানে পৌছতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। আনুষ্ঠানিক শুরুটা গত শতকের ত্রিশের দশকে। কিন্তু এর সুফল পেতে-পেতে দেরি হয়ে গেল যথেষ্ট। তবু আজকের আধুনিক বানানের উজ্জ্বল প্রেক্ষিতটিকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই সময়ে। প্রায়শ শোনা যায়, 'আমরা তো এসব বানান শিখিনি, আপনারা রাতারাতি এসব পালটে দিলেও পুরনো অভ্যেসটিকে কী করে পাল্টাই বলুন?' এর উত্তরে একটা কথা বলতেই হয় যে, বাংলা বানান 'রাতারাতি' পাল্টায়নি। আর, কবে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু—সে-কথা জানাতেই ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হবে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়ে :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাভাষার বানান-সংস্কার ও পরিভাষা ইত্যাদির প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা এবং কিছু নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করার প্রস্তাব দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্যের পদ গ্রহণ করার পরই কবির এই পরামর্শ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্বে, বিশেষজ্ঞ ও উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে বাংলা বানান এবং পরিভাষা নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি কমিটি বা সমিতি গঠন করে দেন। কবিকে এই বানান-সংস্কার ও পরিভাষা নির্ধারণের কাজে সর্বদাই সাহায্য করার জন্য একটি 'রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট' পদের সৃষ্টি হয় এবং তরুণ অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়।

বিজনবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিভাষা সংকলন ও বানান সংস্কারের কাজ করতে লাগলেন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে রবীন্দ্রনাথের কার্যকাল শেষ হলে তাঁর শান্তিনিকেতনের কাজ বন্ধ হল। পরে এ কাজ নতুন উদ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নিয়োজিত হলেন যথাক্রমে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিজনবাবু ছিলেন এর অন্যতম সদস্য।

[নেপাল মজুমদার সম্পাদিত 'বানান বির্তক' গ্রন্থের ভূমিকা]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কেন্দ্রীয় বানান সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা হলেন : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশী ছিলেন সহকারী সম্পাদক।

এই বানান সমিতির প্রস্তাবে তীব্র মতপার্থক্য ও বিরোধ-বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পক্ষে ও বিপক্ষে দুই যুযুধান শিবির তৈরি হলো। সংবাদপত্রগুলো সবসময়ই কাজিয়া লাগাবার তালে থাকে—সুতরাং এই মৌকায় তারাও কোনো-না-কোনো পক্ষে যোগ দিল। বানান সমিতির পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৮ মে ১৯৩৬ সালে। এবং এরপর একটি বছর ধরে তুমুল হইহল্লা চলে। বানান সমিতির প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, এরপরেই শরৎচন্দ্রের। এর বিপক্ষেও বহু মানুষ ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনুরূপা দেবী থেকে শুরু করে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ পর্যন্ত।

প্রথম প্রকাশের পর নানা মহলে তীব্র বাকবিতণ্ডা চলে। এবং স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু নিয়মের পরিবর্তন করে ২ অক্টোবর ১৯৩৭-এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি কয়েকবার মুদ্রিত হয়। আরও নতুন কিছু মত পাওয়া গেল এবারেও। রবীন্দ্রনাথও দু-একটি শব্দের ক্ষেত্রে মত জানালেন। সবদিক বিচার করে আরও কিছু সংশোধন করে, 'ছাত্রগণের নূতন বানানে অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে। প্রথম কয়েক বৎসর পুরাতন বানান লিখিলেও চলিবে' ঘোষণা করে, বানান সমিতির পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণটি ১৯৩৭ সালের ২০ মে প্রকাশ করেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে আজও বিভিন্ন বাংলা অভিধানের পরিশিষ্ট অংশে 'বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত হচ্ছে বটে তবু বঙ্গভাষী-জনতার একটা বিরাট অংশই যে-তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন। এবং এঁরা 'নূতন বানানে অভ্যস্ত' হতে এখনও যে সময় লাগাচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, শ্যামাপ্রসাদ কথিত 'প্রথম কয়েক বৎসর' অনেক ক্ষেত্রেই এখনও শেষ হয়নি।

১৯৩৭ থেকে ২০০৫-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেল মোহনার দিকে, তবু বানান-সচেতনতা শতাংশ হিসেবে আশানুরূপ নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির সুপারিশটিতে টুকিটাকি সংশোধনযোগ্য দিক ছিল এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া কোনো-কোনো শব্দের 'বিকল্প' থাকায় দ্বন্দ্বে ও ধন্ধে পড়াও গেছে। এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়নি এযাবৎ। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'একটি শব্দের একটি বানান' রীতি ও নীতি কবে সর্বজনগ্রাহ্য রূপে আসবে—আমরা জানি না। তবে সে যা-ই হোক, বাংলা বানানের সংস্কার ও আধুনিকতার শুরু কিন্তু তখন থেকেই।

১৯৩৭-এর পর দশক-দশক ধরে পত্র-পত্রিকায় বানান নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। মাঝেমধ্যে আসর সরগরম হয়েছে, কফিহাউসে চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে টাটকা বিতর্ক জমে উঠেছে—তারপর আবার একটু স্তিমিত, ঢিমেতাল। যত দিন গেছে, তত কৌতূহল বেড়েছে, সমস্যা বেড়েছে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অর্থ ও সদিচ্ছা থাকায় নিজেদের সমস্যা নিরসনে তাঁরা নিজেরাই বিশেষজ্ঞ ডেকে-ডেকে হাতেকলমে

কাজ করেছেন। বেশ ক'টি বই এই সুবাদে পাওয়া গেছে বটে, এবং আমাদের উপকারও হয়েছে—কিন্তু ওই বইগুলো নানা মুনির হওয়ায় মতের পার্থক্যও দেখা গেছে। তা ছাড়া 'আনন্দবাজার' এখনও 'সচিন', 'সনিয়া', 'সহবাগ', 'ভাইচুং' প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে 'একলা চলো রে' নীতিতে অটল।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সর্বশেষে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। বস্তুত, বাংলা আকাদেমির বানান-বিধিই এখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম সহ বিভিন্ন বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচার পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রথম শ্রেণির বাংলা বই থেকে শুরু করে ওপরের স্তরে বিভিন্ন বাংলা বইয়ে আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান থেকেই মূলত বানান গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যদিও সামান্য দু'একটি ক্ষেত্রে বিদ্যার্থী অভিধানেও বিতর্কের অবকাশ থেকে যায় তাহলেও এ-মুহূর্তে এই অভিধানটিই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। এখানে একটি কথা বলে রাখি—হামেশাই অভিযোগ ওঠে যে 'আমি অমুক অভিধান দেখে বানান লিখেছি, সেটা কি তাহলে ভুল ?' এর উত্তরে বলা যায়, আসলে প্রতিটি অভিধানেই নির্দিষ্ট সময়ের ছাপ থাকে। সময়ানুসারে বানান যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে সেইসব নয়া বানান ওই পুরনো অভিধানগুলোতে না-থাকারই কথা। যেমন, হালে 'শ্রেণি' বানানটি ই-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে—অথচ পুরাতন সব অভিধানেই তো ওটা দীর্ঘ ই-কার (ী) দিয়ে রয়েছে। পুরনো অভিধানগুলোকে বানানের গতিবিধির জন্য, শব্দের উৎস চিহ্নিত করার জন্য এবং অন্যান্য বহু কারণে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু সচরাচর পুরনো বানান গ্রহণ করি না, বা করাও সম্ভব নয়। তবু আমাদের শ্রদ্ধার আসনে চিরদিন থেকে যাবেন হরিচরণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, রাজশেখর বসু, কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখ অভিধান-প্রণেতারা।

দুই

এ তো গেল গৌরচন্দ্রিকা। এবার মুশকিল ও আসান। বানানের ক্ষেত্রে 'আসান' না-বলে আসানের চেষ্টা বলাই ভালো। আমাদের রাজ্য অসমে বাংলা বানানের ভুল নানা কারণে হচ্ছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ এরকম :

(ক) বাংলা বানান-বিধি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

(খ) আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষার প্রভাব, বিশেষত উচ্চারণগত প্রভাব।

(গ) অসমিয়া বানানের প্রভাব। রাজ্য হিসাবে সর্বত্র অসমিয়া বানানের প্রচার এ-ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। অবশ্য বরাক উপত্যকার কথা স্বতন্ত্র। ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় বাংলা বানানের পরিস্থিতি এ-রাজ্যে এখনও আশাব্যঞ্জক নয়।

সাধারণত দু'দিক থেকে বানান-সমস্যায় আমরা আক্রান্ত হই।

(১) ভুল বানান।

(২) পুরনো বানান।

'ভুল' ভুলই। কোনো যুক্তিতে তাকে শুদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করা যাবে না। কিন্তু পুরনো বানান নিয়েই যত ঝামেলা। আমরা প্রায় সকলেই ছোটবেলা থেকে যে-বানান শিখে অভ্যস্ত হই, বেলা বাড়ার সঙ্গে

সেসব বানানের নতুন রূপ দেখে প্রায় আঁতকে উঠি। যেমন—শ্রেণি, কাহিনি, রচনাবলি ইত্যাদি। এসব চোখকে প্রথমে পীড়া দেয়; গোঁয়ার্তুমি থাকলে মনকেও। আস্তে আস্তে চোখে বসে যায় এর নয়া রূপ। এই যে এত ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট এর মূলে একটি সমস্যাই প্রকট এবং এর সমাধান সূত্রটি সেই কবেই ১৯৩৫- এ বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির প্রস্তাবেই রাখা হয়েছিল। ঝামেলা পাকায় সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দ। তাই এ-মুহূর্তে বাংলা বানানের সর্বপ্রথম ও জরুরি নিয়মটি হলো :

১। সংস্কৃত শব্দ (তৎসম) প্রায় সব ক্ষেত্রেই যেমনটি আছে, তেমনটিই থাকবে, ওতে হাত দেওয়া চলবে না। যেমন, জীবন, চক্রবর্তী, শ্রীমতী, শ্রী ইত্যাদি।

কিন্তু এর বিপরীতে পরের নিয়মটিতে আমরা পাইকারি হারে ছাড় পেয়েছি। বহু শব্দ মূল রূপ (সংস্কৃত রূপ) থেকে সরে এসেছে, বাংলা ভাষার বহু দেশি-বিদেশি শব্দ রয়েছে। সবগুলোর ক্ষেত্রেই বাহুল্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে। সংস্কৃত নয় অথচ সেই শব্দে আমরা অযথা পুরনো বানান রাখছি, এরকম শব্দের একটা তালিকা এখানে তুলে আনা যায় :

পুরনো বানান	নতুন বানান
অসমীয়া	অসমিয়া
বাঙালী/বাঙ্গালী	বাঙালি
দেরী	দেরি
বেশী	বেশি
হাতী	হাতি
বাড়ী	বাড়ি
গাড়ী	গাড়ি
শাড়ী	শাড়ি
কুমীর	কুমির
উনিশ	উনিশ
ইংরেজী/ইংরাজী	ইংরেজি
পিসী	পিসি
মাসী	মাসি
কেরানী	কেরানি
সরকারী	সরকারি
রাণী/রানী	রানি
পূব	পুব
পূজো	পুজো

এরকম দীর্ঘ একটা তালিকা করা যায়। এমনকি বহু তৎসম শব্দ দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুটো রূপেই প্রচলিত।

সে-ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির সোজা নির্দেশ 'সাধারণভাবে হ্রস্ব বিকল্পটিকেই গ্রহণ করা হচ্ছে'। যেমন—

আগের রূপ	বর্তমানে লিখছি
উষা	উষা
অঙ্গুরী	অঙ্গুরি
শ্রেণী	শ্রেণি
কুটীর	কুটির
অন্তরীক্ষ	অন্তরিক্ষ

তেমনি— অবনি, চিৎকার, চুল্লি, ত্রুটি, তরি, দীপাবলি, ধমনি, পঙ্ক্তি, পদবি, পল্লি, পরিপাটি, পেশি, প্রসূতি, বেণি, বেদি, রজনি, সূচি। ইত্যাদি।

এসব মূল শব্দেই হ্রস্ব বিকল্প ছিল, যদি বিকল্প না-থাকে তাহলে যেমনটিই চাই।

যখন কোনো শব্দ সংস্কৃত থাকছে না, তখনই তাকে সরল করা হচ্ছে। 'পূজা' সংস্কৃত, তাই দীর্ঘ ঊ-কার চাইই চাই। কিন্তু 'পুজো' অ-সংস্কৃত, তাই হ্রস্ব উ-কার। তেমনি পুব (< পূর্ব), হাতি (< হস্তী), কুমির (< কুম্ভীর) ইত্যাদি।

এবারে, বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম।

বিসর্গ (ঃ) চিহ্ন

বহু শব্দে একসময় অন্ত্যবিসর্গ লেখার চল ছিল ; তা অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানার পথ ধরেই চলত। এখন সেগুলোকে টা-টা বাই-বাই করে দিয়েছি আমরা।

আগে	এখন
অন্ততঃ	অন্তত
প্রথমতঃ	প্রথমত
ফলতঃ	ফলত
বস্তুতঃ	বস্তুত
ক্রমশঃ	ক্রমশ
প্রায়শঃ	প্রায়শ

সন্ধি হলেও অন্ত্যবিসর্গ দরকার নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে। যেমন—

ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত

তবে পদমধ্যে বিসর্গ রক্ষিত হলে তাকে রাখতেই হচ্ছে। যেমন—

অতঃ + পর = অতঃপর

অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ

কী আর কি

এর একটি সহজ নিয়ম উল্লেখ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'কী লিখবেন কেন লিখবেন'

বইয়ে। সেটি হলো :

কোনো প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' (Yes) বা 'না' (No) হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 'কি' (হ্রস্ব ই-কার দিয়ে) হবে। অন্যত্র সাধারণত 'কী'। যেমন—

তুমি কি খাবে?

তুমি কী খাবে?

প্রথম বাক্যের সরাসরি উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-বাচক হতে বাধ্য। তাই ওটা 'কি'। তেমনি —তুমি খাবে কি?/ আসতে পারি কি? আমি কি সেখানে যাব? ইত্যাদি। সব উত্তরই Yes বা No-তে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয় বাক্যে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমি কোন্‌টা খেতে চাই। এ-ক্ষেত্রে আমি নানান জিনিস খেতে পারি। কানমলা, আছাড়, ভিরমি, রসগোল্লা, দই, গালাগাল, চিকেন বিরিয়ানি— দুনিয়ার যত খাওয়ার ও আজব খাওয়ার অধিকারই রয়েছে আমার।

'কী' তখনই লিখব যখন তা কর্মবাচক হবে বা প্রশ্নমূলক সর্বনাম হবে, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ। যেমন— কী চমৎকার! মেয়েটি কী সুন্দর! লোকটি কী করে তুমি কি তা জান?

তাছাড়া, কী বি জে পি কী কংগ্রেস—সবই লঙ্কায় গেলে রাবণ। কিংবা, কীরকম, কীভাবে, কী জন্য, কী রে, কী ভাই ইত্যাদি।

রেফ (র্) এবং তারপর...

ছোটবেলা থেকেই দেখছি—শর্ম্মা, চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বজনীন, কর্ম্ম, সূর্য্য, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য আরও কত কী।

কারণটা জানতাম না। শর্ম্মা-তে দুটো 'ম'-এর দরকারই-বা কী, বা চক্রবর্ত্তী-র দুটো 'ত' কেন— ঘটে ঢুকত না।

আসলে, সংস্কৃতপন্থীরা ব্যাপারটি চালু করেন যে, ব্যঞ্জন বর্ণের মাথায় রেফ থাকলে তা দ্বিত্ব (অর্থাৎ দুটো) হয়ে যাবে। এজন্য 'রাম ঔর শ্যাম' বা 'সীতা ঔর গীতা'র মতো যমজ বর্ণ দেখতে-দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা। এখন ওপরে রেফ থাকলেও এক বর্ণ দু-দুবার করে লেখার দরকার নেই। যেমন—

আগের	এখনকার
ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য
সূর্য্য	সূর্য
আচার্য্য	আচার্য
অর্চ্চনা	অর্চনা
ঊর্দ্ধ	ঊর্ধ্ব
আর্য্য	আর্য
পূর্ব্ব	পূব
কর্ম্ম	কর্ম

তেমনি— কার্তিক, বার্ধক্য ইত্যাদি।

অসমিয়া ভাষা ও বানানের প্রভাব

অসমিয়া ও বাংলা ভাষা মাগধী মায়ের দুই মেয়ে। একসময় একই পরিবারে বসবাস করলেও এখন দুই বোনের আলাদা-আলাদা সংসার। যে যার মতো ছেলেপুলে নিয়ে বেঁচেবর্তে আছে যদিও আত্মীয়তার সুবাদে আর 'পাশের বাড়ির' প্রভাবে এক বাড়ির পায়সের বাটি, অন্য বাড়ির পিঠেপুলি আদান-প্রদান হচ্ছে। বিশেষত এ-রাজ্যে। তা হোক, কিন্তু তা ভাষার স্বাভাবিক পথ ধরেই হওয়া বাঞ্চনীয়। ভাষাতে গায়ের জোর খাটে না। তাই বহু অসমিয়া শব্দ ও বানান সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হচ্ছেই। রোজ খবরের কাগজে 'খিলঞ্জিয়া' দেখে দেখে চোখ পচে গেলেও তাকে সমাদর করে বাংলা ভাষায় ঠাঁই দেওয়া যাবে না। Constituency শব্দের বাংলা 'নির্বাচনকেন্দ্র' বা সংক্ষেপে 'কেন্দ্র'। কিন্তু অসমিয়া ভাষার আদলে এ-রাজ্যে অমুক 'বিধান সভা সমষ্টি' রূপেই লেখা ও বলা হচ্ছে। 'সমষ্টি'র অন্য অর্থ বাংলায়। আবার ধরুন, বাংলায় 'অনুষ্ঠান' মানে আরম্ভ, উদ্‌যোগ, আয়োজন, নির্বাহ, সভা, অধিবেশন, বৈঠক, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম, উৎসবাদি। অসমিয়াতে 'অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান' একই Institution অর্থ বলা হয়। সেই দেখে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও ভুল বাংলা লিখছে 'কটন কলেজের মতো শিক্ষানুষ্ঠানের...' ইত্যাদি। ওটা আসলে হবে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'।

আমরা মূল থেকে যখনই সরে যাই তখনই বানানকে সহজ ও মেদহীন করে লিখি। অসমিয়া বানান মূলকে ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করে। কিছু উদাহরণ—

মূল শব্দ	অসমিয়া বানান	বাংলা বানান
পর্ণ	পাণ	পান
স্বর্ণ	সোণ / সোণালী	সোনা / সোনালি
কর্ণ	কাণ	কান
বর্ণ	বৰণ	বরন

আমরা 'পানবাজার' লিখলেও অজস্র সাইনবোর্ড, পোস্টার ও খবরের কাগজের সুবাদে কেউ কেউ এখনও অসমিয়ার প্রভাবে 'পাণবাজার' লিখে চলেছেন। সেরকম, 'গুয়াহাটি' অতৎসম হওয়ায় আমরা হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লিখি। কেউ কেউ এখনও 'গুয়াহাটী' লিখছেন ; কিছুটা অসমিয়া-প্রভাবও কাজ করছে এতে।

দুই ভাষা পাশাপাশি থাকলে গ্রহণ-বর্জন চলবেই। তবে তা যেন ভাষার স্বাভাবিক গতিতেই হয়। 'নিম্ন অসম' অর্থে এখন বাংলাতেএ নামনি' অসম চালু হয়েছে। ভালোও লাগছে পড়তে, শুনতে।

শেষকথা

বাংলা বাননের সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে এই স্বল্প পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা উচিত যে, বানান পালটে গেছে আমূল। অভিভাবক, শিক্ষক-ছাত্র, পাঠক সকলকেই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে চলতে হবে নতুবা পিছিয়ে পড়তে হবে।

[পুনর্মুদ্রণ]